কৃষিজ উৎপাদন: গৃহপালিত পশু-পাখি পালন পদ্ধতি

ইউনিট ১০

ভূমিকা

প্রাণীসম্পদের উন্নয়নে পশু পাখি পালন পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের প্রায় সব উন্নত দেশে গৃহপালিত পশু পাখি পালন পদ্ধতি একটি শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে দুগ্ধ খামার গড়ে খামার ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারলে খামারিরা সহজেই গাভী পালন করে দেশকে উন্নতমানের তরল আমিষ সরবরাহের পাশাপাশি দেশের মানুষের মেধা বিকাশ ও নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারবেন। আর দেশের কৃষি অর্থনীতিও হবে সম্মৃদ্ধ। মাংস উৎপাদন বা দুগ্ধ খামারের ভবিষ্যত নির্ভর করে বাছুরের সন্তোষজনক বৃদ্ধির ওপর। কারণ আজকের বাছুরই ভবিষ্যতের মাংস উৎপাদনকারী গরু, উন্নতমানের প্রজনন উপযোগী ষাঁড় বা দুধ উৎপাদনশীল গাভী। বাংলাদেশে ভেড়ার উন্নত জাত নেই। উন্নত ভেড়ার জাতের সঙ্গে প্রজনন করালে উন্নত মানের উল এবং মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত পাওয়া যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক পর্যায়ে হাঁস পালন একটি অত্যন্ত প্রাচীন রীতি। তাই অল্প মূলধনে হাঁস পালন করে ডিম বিক্রি করে বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়। মাছের পুকুরে হাঁস চাষ করলে খামারিরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আরও লাভবান হতে পারেন। এসব গুরুত্বে কথা বিবেচনায় রেখেই এই ইউনিটে গাভী পালন, বাছুর পালন, ভেড়া পালন ও হাঁস পালন আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১০.১ : গাভী পালন
পাঠ - ১০.২ : বাছুর পালন
পাঠ - ১০.৩ : ভেড়া পালন
পাঠ - ১০.৪ : হাঁস পালন

পাঠ-১০.১ গাভী পালন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- দুগ্ধ শিল্প কি ও এদেশে বার্ষিক দুধ উৎপদনের পরিমাণ কত তা বলতে পারবেন।
- উন্নত জাত ও সংকর জাতের গাভী কি, কোথায় পাওয়া যায় এবং কোন জাতের গাভী দিয়ে খামার শুরু করতে হবে, তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- অধিক দুধ উৎপাদনকারী জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	দুগ্ধ শিল্প, গাভী, সংকর জাত, হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান, উন্নত জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্য, গাভীর খাদ্য, গাভীর পরিচর্যা, প্রসবকালীন, শালদুধ, দুধ দোহন, রোগপ্রতিরোধ।

দুগ্ধ শিল্প

প্রাণীসম্পদ তথা কৃষির বিকাশ ও অগ্রগতির সঙ্গে গাভী পালন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এদেশে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, কোন জাতির মেধার বিকাশ মূলত সে জাতি কতটুকু দুধ পান করে তার ওপর নির্ভর করে। আর তাই দেখা যায় বিশ্বের প্রায় সব উন্নত দেশেই দুগ্ধ শিল্প বা ডেয়রি ইন্ডাস্ট্রি একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্প হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু সেই তুলনায় আমরা অনেকটাই পিছিয়ে। এদেশে প্রতিবছর দুধের চাহিদা ১২.৫২ মিলিয়ন মেট্রিক টনের বিপরীতে উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ২.২৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। অবশ্য বর্তমানে এদেশের অনেকেই দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীর খামার গড়তে আগ্রহী হচ্ছেন। আর তাই দেশে প্রায় ৪৮,০০০টি খামার গড়ে উঠেছে। তবে এসব খামারের বেশিরভাগ ছোট ও মাঝারি আকারের। তবে পরিকল্পিতভাবে দুগ্ধ খামার গড়ে খামার ব্যবস্থাপনার খুটিনাটি বিষয়গুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারলে খামারিরা সহজেই গাভী পালন করে দেশকে উন্নতমানের তরল আমিষ সরবরাহের পাশাপাশি দেশের মানুষের মেধা বিকাশ ও নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারবেন। আর দেশের কৃষি অর্থনীতিও হবে সমৃদ্ধ।

খামার গড়তে প্রাথমিক প্রস্তুতি

লাভজনক গাভী অর্থাৎ দুগ্ধ খামার গড়তে হলে সবার আগে প্রয়োজন প্রাথমিক প্রস্তুতি। আর এই প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে খামারের সফলতা বা ব্যার্থতা। দুগ্ধ খামারের সফলতা নির্ভর করে খামারির আর্থিক সঙ্গতি, অভিজ্ঞতা, উন্নত জাতের গাভী, নিরাপদ বাসস্থান ও সুষম খাদ্য সরবরাহের ওপর। শুরুতেই বিশাল আকারের খামারের কথা চিন্তা না করে ছোট আঙ্গিকে খামার গড়ার পরিকল্পনা করা উচিত। তাই ৫-৬টি গাভী নিয়ে যাত্রা করে ধীরে ধীরে খামার সম্প্রসারণ করাই উত্তম। দু'টি গাভীর পালনের জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন করে দক্ষ লোক নিয়োগ দেয়া উচিত।

গাভীর খামারের স্থান নির্বাচন

গাভীর খামার এমন জায়গায় নির্মাণ করতে হবে যেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ও দুধ বিক্রির যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে। খামারের চারপাশে উঁচু দেয়াল, পরিবেশসম্মত আবাসন, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস এবং গাভীর বিশ্রাম ও হাঁটাচলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে। স্থান নির্বাচন ও বাসস্থান নির্মাণ হয়ে গেলে উন্নত জাতের গাভী নির্বাচন ও ক্রয় করতে হবে।

উন্নত জাতের গাভী

দুগ্ধ খামার থেকে ভালো উৎপাদন পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হবে উন্নত জাতের গাভী। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত জাতের গাভী, যেমন:- হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান, জার্সি, আয়ারশায়ার, মিল্কিং শর্টহর্ন ইত্যাদি থেকে যেখানে দৈনিক ৩০-৫০ লিটার দুধ পাওয়া যায়, সেখানে আমাদের দেশের স্থানীয় জাতের গাভী থেকে মাত্র ১-৫ লিটার দুধ পাওয়া যায়। তবে শীতপ্রধান

দেশের উন্নত জাতের অধিক উৎপাদনশীল গাভীগুলো এদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় তেমনভাবে টিকতে পারে না। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ইতোপূর্বে আনা সিন্ধি ও শাহীওয়াল ৭-১০ লিটারের বেশি দুধ দেয় না। আমাদের দেশের স্থানীয় জাত রেড চিটাগাং, পাবনা ও সাদা সিন্ধি অনুল্লেখিত জাতসমূহের থেকে বেশি উৎপাদন দিলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কাজেই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশী জাতের গাভীকে হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান, জার্সি, শাহিওয়াল, সিন্ধি প্রভৃতি জাতের ষাড়ের বীর্য দিয়ে প্রজনন করালে যে সংকর জাতের সৃষ্টি হয় তা একদিকে যেমন অধিক দুধ উৎপাদনশীল হয়, অন্যদিকে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্নও হয়। তবে এ সংকর জাতগুলোর মধ্যে হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ানের সংকরই সবচেয়ে ভালো। উন্নত ব্যবস্থানায় একটি হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের গাভী থেকে ১৫-৩৫ লিটার দুধ পাওয়া সম্ভব। কাজেই লাভজনক গাভী খামার গড়তে হলে হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের গাভী দিয়েই শুরু করা উচিত।

উন্নত জাতের গাভীর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা সদর, সাভার ও কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনার বাঘাবাড়ি, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ইত্যাদি এলাকায় উন্নত জাতের গাভী বেশি দেখা যায়।

উন্নত জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্য

উন্নত জাতের গাভীর মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে। যেমন:-

- মাথার আকার ছোট ও হালকা, কপাল প্রশস্ত ও চোখ হবে উজ্জ্বল।
- দৈহিক আকার আকর্ষণীয় ও দেহের গঠন ঢিলেঢালা হবে। দেহের সামনের দিক হালকা, পিছনের দিক ভারী ও সুগঠিত হবে।
- পাজরের হাড় স্পষ্ট ও হাড়ের গঠন সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- চামড়া পাতলা, চামড়ার নীচে অযাচিত চর্বি থাকবে না। চাড়ার রঙ উজ্জ্বল, লোম মসৃণ ও চকচকে হবে।
- ওলান বড়, সুগঠিত ও দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ওলানের বাটগুলো একই আকারের হবে এবং চারটি বাট সমান দূরত্বে থাকবে ও সমান্তরাল হবে।
- দুগ্ধশিরা মোটা ও স্পষ্ট হবে। তলপেটে নাভীর পাশ দিয়ে দুগ্ধশিরা আঁকাবাঁকাভাবে বিস্তৃত থাকবে।

গাভীর পরিচর্যা

গাভীর পরিচর্যার লক্ষ্য হলো গাভীকে অধিক কর্মক্ষম রাখা। গাভীর সঠিক পরিচর্যা না হলে উন্নত জাতের গাভী পালন করেও গাভীকে সুস্থ-সবল ও উৎপাদনক্ষম রাখা যাবে না। ফলে গাভী থেকে কাঙ্খিত পরিমাণে দুধ পাওয়া যাবে না। এতে খামারি লোকসানে মুখে পড়বেন। কাজেই গাভীকে নিয়মিত গোসল করানো, শিং কাটা, খুর কাটা ইত্যাদির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তাছাড়া গাভীকে বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ, যেমন:- মশা-মাছি থেকে নিরাপদ রাখতে কবে। এসব পরিচর্যায় গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ও উৎপাদনে ভালো প্রভাব পড়বে।

গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর যত্ন

গর্ভকালীন সময়ে গাভীর দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত কারণ এই সময় গাভীর গর্ভে বাচ্চা বড় হতে থাকে। এসময় গাভীকে প্রচুর পরিমাণে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রসবের কয়েক দিন আগে থেকে প্রসবকালীন সময় পর্যন্ত গাভীকে আলাদা জায়গায় রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। জায়গাটি সমতল হতে হবে। গর্ভকালীণ সময়ে অবহেলা করলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া গাভী প্রজনন ও গর্ভধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। প্রসবের লক্ষণ দেখা দিলেই গাভীকে শান্ত পরিবেশে রেখে ২-৩ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রসব অগ্রসর না হলে প্রাণী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। প্রসবের পর বাছুরকে অবশ্যই শালদুধ পান করাতে হবে। কারণ এই শালদুধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও বাছুরকে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। বাচ্চা প্রসবের পর ফুল পড়ে গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। গাভী বাচ্চা প্রসবের পর ৫-৭ দিন পর্যন্ত শালদুধ দেয়। এর পরে স্বাভাবিক দুধ পাওয়া যায়। বাচ্চা প্রসবের ৯০ দিনের মধ্যে গাভী পুনরায় গরম না হলে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

দুগ্ধ দোহনকালীন পরিচর্যা

দৈনিক ভোরে একবার ও বিকালে একবার নির্দিষ্ট সময়ে গাভীর দুধ দোহন করতে হবে। দুধ দোহনের আগে গাভীর ওলান ও দোহনকারীর হাত পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুতে হবে। দোহনকালীন সময় গাভীকে উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকতে হবে ও দ্রুততার সঙ্গে দুধ দোহন সম্পন্ন করতে হবে।

গাভীর খাদ্য

গাভীর দৈহিক বৃদ্ধি এবং কোষকলার ক্ষয়পূরণ ও বিকাশ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, দুধ উৎপাদন, প্রজননে সক্ষমতা অর্জন, গর্ভাবস্থায় বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধিসাধন ইত্যাদির জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য পরিবেশনে শর্করা, আমিষ ও স্নেহপদার্থের প্রতুলতার দিকে নজর দিতে হবে। গাভীর সুষম খাদ্যতালিকার উদাহরণ সারণি ১২-১৪-এ দেয়া হয়েছে।

গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ও রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা

গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন বলতে এমন কতগুলো বিধি ব্যবস্থাকে বোঝায় যা মেনে চললে গাভীকে রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে অধিক দুধ উৎপাদন করা যায়। এগুলো নিম্নরূপ:-

- পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থাসহ দূর্যোগ নিবারণের সুবিধাসম্পন্ন বাসস্থান নির্মাণ করা।
- খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- পচা-বাসি ও ময়লাযুক্ত খাদ্য ও পানি পরিহার করা।
- সব সময় তাজা ও বিশুদ্ধ খাবার ও পানি সরবরাহ করা।
- নিয়মিত কৃমিনাশকের ব্যবহার করা।
- নিয়মিত সংক্রামক ব্যাধির টিকা প্রদান করা।
- দ্রুত মলমূত্র নিষ্কাশন করা।
- প্রজনন ও প্রসবে নির্জীবাণু পদ্ধতি অবলম্বণ করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শ্রেনি কক্ষে গাভী পালনের পদ্ধতি বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

প্রাণীসম্পদ তথা কৃষির বিকাশ ও অগ্রগতির সঙ্গে গাভী পালন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। দুগ্ধ খামার থেকে ভালো উৎপাদন পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হবে উন্নত জাতের গাভী। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত জাতের গাভী, যেমন:- হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান, জার্সি, আয়ারশায়ার, মিল্কিং শর্টহর্ন ইত্যাদি থেকে যেখানে দৈনিক ৩০-৫০ লিটার দুধ পাওয়া যায়, সেখানে আমাদের দেশের স্থানীয় জাতের গাভী থেকে মাত্র ১-৫ লিটার দুধ পাওয়া যায়। তবে শীতপ্রধান দেশের উন্নত জাতের অধিক উৎপাদনশীল গাভীগুলো এদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় তেমনভাবে টিকতে পারে না। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ইতোপূর্বে আনা সিন্ধি ও শাহীওয়াল ৭-১০ লিটারের বেশি দুধ দেয় না। গাভীকে নিয়মিত গোসল করানো, শিং কাটা, খুর কাটা ইত্যাদির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। দৈনিক ভোরে একবার ও বিকালে একবার নির্দিষ্ট সময়ে গাভীর দুধ দোহন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে প্রতি বছর দুধের চাহিদার পরিমান কত মিলিয়ন মেট্রিক টন?

ক) ১২.৫২ খ) ১৩.৫২ গ) ১৪.৫২ ঘ) ১৫.৫২

২। প্রসবের লক্ষণ দেখা দিলে গাভীকে কত ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে?

ক) ৬-৭ খ) ৫-৬ গ) ৪-৫ ঘ) ২-৩

৩। গাভীর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা-

i) নিয়মিত কৃমিনাষক ব্যবহার করা
ii) পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখা
iii) সর্বদা তাজা ঘাস সরবরাহ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.২ বাছুর পালন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাছুরের বাসস্থান সম্পর্কে ধারনা পাবেন।
- বাছুরের পরিচর্যা লিখতে পারবেন।
- বাছুরের খাদ্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	গরু-মহিষ, শৈশবকাল, বাছুর, বাছুরের বাসস্থান, খোপ, পরিচর্যা, খাদ্য, খাদ্য পরিবেশন।

বাছুর

বাছুর হলো গরু-মহিষের শৈশবকাল। অর্থাৎ জন্মের পর থেকে এক বছরের বেশি বয়সের গরু-মহিষের বাচ্চাই সচরাচর বাছুর নামে পরিচিত। মাংস উৎপাদন বা দুগ্ধ খামারের ভবিষ্যত নির্ভর করে বাছুরের সন্তোষজনক বৃদ্ধির ওপর। কারণ আজকের বাছুরই ভবিষ্যতের মাংস উৎপাদনকারী গরু, উন্নতমানের প্রজনন উপযোগী ষাঁড় বা দুধ উৎপাদনশীল গাভী। এদেশে পালিত গবাদিপশুর প্রায় এক-চতুর্থাংশই (২৫%) বাছুর। এরা অত্যন্ত রোগ সংবেদনশীল হয়। তাই সুস্থ-সবল বাছুর পেতে হলে একদিকে যেমন গর্ভাবস্থায় গাভীর পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য ও যত্ন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন প্রসবকালীন ও জন্মের পর নবজাতক বাছুরের সঠিক পরিচর্যা।

বাছুরের বাসস্থান

বাছুরের জন্মকালীন গড় ওজন জাতভেদে ভিন্ন হতে পারে, যেমন:- দেশী ও উন্নত জাতের বাছুরের ওজন যথাক্রমে ১৫-২০ কেজি হয়। অবশ্য উন্নত ও সংকর জাতের বাছুরের জন্মকালীন ওজন প্রায় ২৫-৩০ কেজি হতে পারে। মূলত বাছুরের আকারের ওপর নির্ভর করে এর বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ। বাছুরের ঘর নির্মাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। যথা:-

- প্রচুর আলো-বাতাস প্রবেশের সুবিধা রয়েছে এমন জায়গায় বাছুরের ঘর তৈরি করতে হবে।
- ঘরে প্রতিটি বড় আকারের বাছুরের জন্য ৩.২৪ বর্গ মিটার ও ছোট আকারের বাছুরের জন্য ১.১১ বর্গ মিটার জায়গা বা খোপের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাছুরের বাসস্থান কাঁচা বা পাকা যাই হোক না কেন এতে মলমূত্র নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- মেঝে পাকা না হলে তা যেন কর্দমাক্ত ও স্যাঁতসেঁতে না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।
- বাছুরের খোপে খড়-বিচালি দিয়ে বিছানা তৈরি করতে হবে।

বাছুরের পরিচর্যা

বাছুরের পরিচর্যা বলতে এদেরকে সময়মতো ও পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য পরিবেশন, কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান, রোগবালাইয়ের চিকিৎসা করা ও অন্যান্য যত্ন-আত্তি করাকে বোঝায়। যদিও গবাদিপশু বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী বাছুর ভুমিষ্ট হওয়ার পর থেকে দৈহিক পরিপক্কতা অর্জন করে সাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত এদেরকে পরিচর্যা করতে হয়, কিন্তু এদেশে এটি তেমনভাবে মানা হয় না। তবে ভবিষ্যতে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়ার জন্য বাছুরের সুষ্ঠু পরিচর্যা দরকার। এখানে আধুনিক পদ্ধতিতে বাছুরের পরিচর্যার কলাকৌশল নিম্নে বর্ণিত হলো:-

- **বাছুরকে শালদুধ পান করানো:** নবজাতক বাছুরকে জন্মের এক ঘন্টা পর থেকে ৩-৪ দিন পর্যন্ত মায়ের বাট থেকে নিঃসৃত গাঢ় বা হালকা হলদে রঙের শালদুধ বা কাচলা দুধ (colostrum) পান করাতে হবে। শালদুধে বাছুরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টিবডি (antibody) থাকে। এছাড়াও শালদুধে প্রচুর

পরিমাণে শর্করা, আমিষ ও ভিটামিন-এ থাকে। আমাদের গ্রামে-গঞ্জে অনেকেই অজ্ঞতার জন্য এ শালদুধ বাছুরকে খেতে দেয় না, দোহন করে ফেলে দেয়। এটা কখনোই করা উচিত নয়।

- **বাছুরকে গাভীর দুধ পান করা শেখানো:** জন্মের পরই কিন্তু বাছুর স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাভীর বাট চুষে দুধ পান করতে পারে না বা জানে না। বাছুরকে তাই বাট মুখে পুরে দুধ চুষে পান করতে শেখাতে হয়।
- **খামার পর্যায়ে বাছুর চিহ্নিতকরণ বা ট্যাগ নম্বর লাগানো:** পারিবারিক খামারে বাছুর চিহ্নিতকরণের প্রয়োজন না হলেও খামারে পালিত বাছুরের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে বাছুরের সব ধরনের তথ্য সংরক্ষণে সুবিধা হয় এবং খামার ব্যবস্থাপনাও সহজ হয়ে যায়।
- **পরিমিত খাদ্য পরিবেশন:** বাছুর পালনে দৈনিক পরিমিত খাদ্য পরিবেশনের কোন বিকল্প নেই। বর্ধিষ্ণু বাছুরের চাহিদা অনুযায়ী জন্মের পর থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যতালিকা অনুযায়ী নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- **মলমূত্র নিষ্কাশন ও বিছানা পরিষ্কার করা:** স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পালনের জন্য বাছুরের শোয়ার ঘর ও রক্ষনাবেক্ষণের ঘরটিতে মলমূত্র নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে। কেননা মলমূত্র থেকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয় ও বাছুর কৃমিসহ নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। বাছুরের খোপে বিছানা হিসেবে যে খড় দেয়া হয় তাও মাঝেমধ্যে পরিষ্কার করে শুকনো রাখতে হবে।
- **সময়মতো বাছুর খোপে ওঠানো ও নামানো:** বাছুরকে নিয়মিত খোপে ওঠানামা করাতে হয়। এদেরকে যেমন সারাদিন খোপে আবদ্ধ করে রাখা ঠিক নয়, তেমনি দিনভর খোলা জায়গায় বিচরণ করতে দেয়াও উচিত নয়। এটা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা নির্বিশেষে সব মৌসুমে করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত শীতে বা বৃষ্টিতে ভিজলে বাছুর নিউমোনিয়া বা ফুসফুস প্রদাহে আক্রান্ত হতে পারে।
- **বাছুরের প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ:** প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ বাছুর পরিচর্যার অন্যতম করণীয় কাজ। তাছাড়া মাঝে মাঝে এদের দৈহিক বৃদ্ধি বা অবণতির পরিমাপ করতে হবে। জন্মের দিন থেকে দৈনিক ওজন মাপা হলে এদের দৈনিক বৃদ্ধির হার সহজেই বোঝা যাবে। পারিবারিকভাবে না হলেও খামারভিত্তিতে এটি পালন করতে হবে।
- **রোগপ্রতিরোধ ও রোগচিকিৎসা:** বাছুরকে নিয়মিত টিকাদান করতে হবে ও কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে। বাছুর রোগাক্রান্ত হলে দ্রুত ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সুস্থ্য-সবল গাভী থেকেই সঠিক উৎপাদন পাওয়া যাবে।

বাছুরের খাদ্য

উন্নত বিশ্বে জন্মের পরপরই বাছুরকে মা থেকে আলাদা করে নিয়ে পালন করা হয়। অন্যদিকে, এদেশে পারিবারিক বা খামার উভয় পদ্ধতিতেই বাছুরকে মায়ের সঙ্গে রেখে অন্তত ৬ মাস পালন করা হয়। এ সময় বাছুর মূলত মায়ের দুধ পান করে বড় হয়। তবে যেভাবেই পালন করা হোক না কেন লক্ষ্য রাখতে হবে এরা যেন খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুষ্টি পায়। তা না হলে পরবর্তীতে এদের থেকে কাঙ্খিত মাংস বা দুধ উৎপাদন পাওয়া যাবে না। সারণি ১৫-এ বাছুরের জন্য দু'টি খাদ্য মিশ্রণ দেখানো হয়েছে। এছাড়াও সারণি ১৬-এ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাছুরকে কি পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে তা দেখানো হয়েছে।

সারণি ১৫: বাছুরের জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ

খাদ্য উপকরণ	শতকরা অংশ (শুষ্ক পদার্থে)	
	মিশ্রণ ১	মিশ্রণ ২
গম/ ভুট্টা /চাল ভাঙ্গা	১০	১৫
গমের ভুশি	৩৫	৩০
চালের ভুশি	২০	২৫
খেসারির ভুশি	১০	-
তিলের খৈল	১৫	১০
নারিকেলের খৈল	-	১৫
শুটকি মাছের গুঁড়া	৫	-
শামুক/ঝিনুকের গুঁড়া	৩	৩
খাদ্য লবণ	২	২
সর্বমোট	১০০	১০০

উৎস: হক, মো.আ., আলী, শে.জি. ও রহমান, আ.ন.ম.আ. (২০০৪). *গৃহপালিত পশুপালন*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৯৩।

সারণি ১৬: বয়স বাড়ার সঙ্গে বাছুরের খাদ্য পরিবেশন

বাছুরের বয়স	পরিবেশনযোগ্য খাদ্য উপাদান
জন্মের প্রথম ২ সপ্তাহ	সকাল ও বিকালে মোট দু'বার শালদুধ সরবরাহ করতে হবে।
৩-১২ সপ্তাহ	দিনে দু'বার দুধ পান করাতে হবে। তাছাড়া ৩য় সপ্তাহ থেকে কিছু কচি পাতা, ঘাসের ডগা ও ৮ম সপ্তাহ থেকে সামান্য দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
১৩-১৬ সপ্তাহ	দিনে দু'বার দুধ পান করাতে হবে। সেই সাথে মাথাপিছু ১.০ কেজি সবুজ ঘাস ও ৫০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
১৭-২০ সপ্তাহ	দিনে দু'বার দুধ পান করাতে হবে। মাথাপিছু ৩.০ কেজি সবুজ ঘাস ও ৭৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
২১-২৪ সপ্তাহ	দিনে দু'বার দুধ পান করাতে হবে। মাথাপিছু ৫.০-৭.০ কেজি সবুজ ঘাস ও ১.০ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
২৫-৩৫ সপ্তাহ	দুধ পান বন্ধ করতে হবে। কিন্তু মাথাপিছু ৫.০-৭.০ কেজি সবুজ ঘাস, ১.০-২.০ কেজি খড় ও ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
৩৬-৫০ সপ্তাহ	মাথাপিছু ১০.০-১২.০ কেজি সবুজ ঘাস, ২.০-৩.০ কেজি খড় ও ১.৫-২.০ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

উৎস: হক, মো.আ., আলী, শে.জি. ও রহমান, আ.ন.ম.আ. (২০০৪). *গৃহপালিত পশুপালন*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৯৩।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা জন্মের দিন থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে কিভাবে পরিচর্যা করা যায় তা নিয়ে ক্লাশে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

বাছুর হলো গরু-মহিষের শৈশবকাল। মাংস উৎপাদন বা দুগ্ধ খামারের ভবিষ্যত নির্ভর করে বাছুরের সন্তোষজনক বৃদ্ধির ওপর। মূলত বাছুরের আকারের ওপর নির্ভর করে এর বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ। তাই বাসস্থানে বাছুরের আকার অনুযায়ী বাছুরপ্রতি ১.১১-৩.২৪ বর্গ মিটার জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। বাছুরের পরিচর্যা বলতে এদেরকে সময়মতো ও পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য পরিবেশন, কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান, রোগবালাইয়ের চিকিৎসা করা ও অন্যান্য যত্ন-আত্তি করাকে বোঝায়। বাছুরকে আলাদাভাবে বা মায়ের সঙ্গে রেখে যেভাবেই পালন করা হোক না কেন লক্ষ্য রাখতে হবে এরা যেন খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুষ্টি পায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেরকে সঠিক নিয়মে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য পরিবেশন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

১। বাছুরের পরিচর্যার অর্ন্তভূক্ত-

i) শাল দুধ খাওয়ানো
ii) মল মুত্র ও বিছানা পরিষ্কার
iii) বাসস্থান তৈরি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২ নং ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

জসিম সাহেবের গাভীটি একটি বাচ্চা প্রসব করেছে। তিনি নিয়মিত বাছুরের যত্ন নেন।

২। বাংলাদেশে পালিত গবাদি পশুর শতকরা কত ভাগ বাছুর?

ক) ২০ খ) ২৫ গ) ৩০ ঘ) ৩৫

৩। জসীম সাহেব বাছুরকে দেন-

i) দানাদার খাদ্য হিসেবে নারিকেলের খৈল (মিশ্রন-২) ১৫ শতাংশ
ii) তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কচি পাতা, ঘাসের ডগা খাদ্য হিসেবে দেন।
iii) খড় বিচালি ও সাইলেজ খাদ্য হিসেবে দেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৩ ভেড়া পালন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে ভেড়ার অবস্থা বলতে পারবেন।
- ভেড়া পালনের সুবিধাগুলো সহজেই লিখতে পারবেন।
- ভেড়ার বাসস্থান ও ঘরের ধরন বলতে পারবেন।
- ভেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ লিখতে পারবেন।
- ভেড়ার পরিচর্যা বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ভেড়া, উল, বাসস্থান, ঘর, খাদ্য, পরিচর্যা, বহিঃপরজীবিনাশক, কৃমিনাশক।

বাংলাদেশের ভেড়া

ভেড়ার অত্যন্ত গুণী প্রাণী। কিন্ত এত গুণাগুণ থাকা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশে এরা বেশ অবহেলিত ও তেমন একটা জনপ্রিয় নয়। সংখ্যাও খুব অল্প। এদেশের ভেড়ার কোনো ভালো জাত নেই। ভেড়া শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়ার প্রাণী। এদেশের ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া এদের জন্য উপযোগী নয়। বাংলাদেশে নোয়াখালী ও বরিশালের উপকূলীয় অঞ্চলেই বেশি সংখ্যায় ভেড়া পালন করা হয়। আমাদের দেশের স্থানীয় জাতের ভেড়ার লোম সাদা হলেও অযত্নের কারণে তা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এদের পশম অত্যন্ত মোটা ও নিম্নমানের। তাই এ থেকে উৎকৃষ্টমানের উল তৈরি করা যায় না। এ উল থেকে কম্বল ছাড়া অন্য কিছু তৈরি করা সম্ভব নয়। বাস্তবে, এদেশে ভেড়া থেকে মাংস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না বললেই চলে। এ মাংসও বেশিরভাগ লোকই পছন্দ করেন না। তবে এদেশের ভেড়ার প্রতি কিছুটা নজর দিলে সহজেই এ থেকে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। বিদেশী উন্নত জাতের ভেড়ার সঙ্গে প্রজনন ঘটিয়ে সংকর জাত সৃষ্টি করলে তা থেকে উন্নতমানের উলও পাওয়া যাবে। ফলে ভেড়া পালন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়ে ওঠবে।

ভেড়া পালনের সুবিধাদি

ভেড়া পালনের অনেক সুবিধা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:-

- ভেড়া তুলনামূলকভাবে দামে সস্তা ও দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। প্রতি বিয়ানে একেকটি ভেড়ি ১-৪টি বাচ্চার জন্ম দেয়। ছাগলের মতো এরাও ১৫ মাসে দু'বার বাচ্চা দেয়। তবে এদের পরিপক্কতা কিছুটা দেরিতে আসে।
- তেমন কোন সম্পূরক খাদ্য ছাড়াই শুধু ঘাস খেয়ে এরা বেঁচে থাকতে পারে। আগাছাপূর্ণ ভূমি পরিষ্কার করতে এদের জুড়ি নেই। আগাছা, ঘাস, লতাগুল্ম, মূল, কন্দ, শস্যদানা, পাতা, ছাল, এমনকী খাদ্য ঘাটতির সময় প্রয়োজন হলে মাছ বা মাংসও খেতে সক্ষম।
- ঘাস খেয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এরা তা উল ও মাংসে রূপান্তরিত করতে পারে।
- ছাগলের মতো ভেড়া গাছগাছড়া নষ্ট করে না।
- এরা সর্বদা দলনেতাকে অনুসরণ করে, তাই লালন-পালন ও ব্যবস্থাপনা বেশ সহজ।
- এদের জন্য তেমন কোনো উন্নতমানের বাসস্থানের প্রয়োজন হয় না।
- ভেড়ার মাংস ও দুধ বেশ সুস্বাদু। এদের চামড়া বিক্রি করেও ভালো অর্থ আয় করা যায়।
- ভেড়ার লোম বা পশমই উল (wool) নামে পরিচিত। এগুলো অত্যন্ত দামি। উল থেকে শীতের কাপড়, কম্বল, শাল ইত্যাদি তৈরি হয়।
- গোবর ও চনা উৎকৃষ্টমানের জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ভেড়ার হাড়ের গুঁড়ো গবাদিপশু ও পোল্ট্রির খাদ্য এবং উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নাড়িভুঁড়ি ও রক্তে রয়েছে উন্নতমানের আমিষ যা হাঁসমুরগির খাদ্য হিসেবে বেশ জনপ্রিয়।
- সর্বোপরি ভেড়া অত্যন্ত অর্থকরী প্রাণী।

ভেড়ার বাসস্থান

ভেড়ার জন্য বাসস্থান তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কারণ এরা প্রধানত মাঠে চরে ঘাস খাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। এদেরকে ঘাসপূর্ণ বিস্তীর্ণ মাঠে পালন করা হয় যেখানে দল বেধে ঘাস খেতে খেতে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যেতে থাকে। রাতের বেলা মাঠেই একসঙ্গে বিশ্রাম নেয়। তবে শীতপ্রধান দেশে শীতকালে এদের জন্য বাসস্থানের দরকার পড়ে। তাছাড়া আরও কয়েকটি কারণে ভেড়ার বাসস্থানের প্রয়োজন পড়ে। যেমন:-

- রাতের বেলা ভালোভাবে বিশ্রাম নেয়ার জন্য।
- শিকারী প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।
- যেসব ভেড়া বেশি দুধ দেয় তাদের দুধ দোহনের জন্য।
- গর্ভবতী, প্রসূতি ও বাচ্চা ভেড়ার সঠিক পরিচর্যা করার জন্য।
- চোরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
- আমাদের মতো স্যাঁতস্যাঁতে দেশে ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

ভেড়ার ঘরের ধরন

ভেড়া পালনের জন্য প্রধানত তিন ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয়। যেমন:-

ক) খোলা বা উন্মুক্ত ঘরঃ যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম হয় সেখানে উন্মুক্ত ঘরে ভেড়া পালন করা হয়। নির্দিষ্ট জায়গার চারদিকে বেড়া দিয়ে এ ধরনের ঘর তৈরি করা হয়। এতে কোন ছাদ থাকে না। মেঝেতে প্রধানত খড় ব্যবহার করা হয়।

খ) আধা-উন্মুক্ত ঘরঃ চারদিক ঘিরে বেড়া দেয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানের এক কোণে খানিকটা জায়গা ছাদ দিয়ে ঘিরে এ ধরনের ঘর তৈরি করা হয়।

গ) আবদ্ধ বা ছাদযুক্ত ঘরঃ এ ধরনের ঘরের পুরো অংশই ছাদ দিয়ে ঘেরা থাকে। ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে। মেঝে পাকা বা আধাপাকা হতে পারে। আমাদের মতো দেশে ভেড়া পালনের জন্য এ ধরনের ঘরই বেশি উপযোগী। ভেড়া সারাদিন মাঠে চড়বে ও রাতের বেলা ঘরে আশ্রয় নেবে। তাছাড়া ঝড়বৃষ্টি বা খারাপ আবহাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ধরনের ঘর অত্যন্ত দরকারি।

ভেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা

ভেড়ার জন্য ভূমিসমতল মেঝে (খড়ের তৈরি) বা মাঁচার মেঝে তৈরি করা যায়। মাঁচার মেঝেতে জীবাণু ও কৃমি সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে। তাছাড়া এটি স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। মাঁচার তৈরি মেঝেতে ভেড়ার জন্য তুলনামূলকভাবে জায়গাও কম লাগে। সারণি ১৭-এ বিভিন্ন বয়সের ভেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ১৭: মাঁচা মেঝে ও খড়ের মেঝেতে বিভিন্ন বয়সের ভেড়ার জন্য বরাদ্দকৃত জায়গার পরিমাণ

ভেড়ার ধরন	মাঁচার মেঝে (বর্গ মিটার)	খড়ের মেঝে (ভূমিসমতল) (বর্গ মিটার)
বাচ্চা ছাড়া বড় ভেড়ী (৬৮-৯০ কেজি)	০.৯৫-১.১০	১.২০-১.৪০
বাচ্চাসহ বড় ভেড়ী (৬৮-৯০ কেজি)	১.২০-১.৭০	১.৪০-১.৮৫
বাচ্চা ছাড়া ছোট ভেড়ী (৪৫-৬৮ কেজি)	০.৭৫-০.৯৫	১.০০-১.৩০
বাচ্চাসহ ছোট ভেড়ী (৪৫-৬৮ কেজি)	১.০০-১.৪০	১.৩০-১.৭৫
মর্দা ভেড়া (৩২ কেজি)	০.৫৫-০.৭৫	০.৭৫-০.৯৫
মর্দা ভেড়া (২৩ কেজি)	০.৪৫-০.৫৫	০.৬৫-০.৯৫
বাচ্চা ভেড়া (৬ সপ্তাহ)	-	০.৪০
বাচ্চা ভেড়া (২ সপ্তাহ)	-	০.১৫

উৎসঃ Scott, W. N. (1978). *The Care and Management of Farm Animals*, Bailliere Tindall, UK p. 90.

ভেড়ার পরিচর্যা

ভেড়াকে সুস্থ-সবল ও কর্মক্ষম রাখা ও এর থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন পেতে হলে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে। গরু, মহিষ বা ছাগলের মতোই দৈনিক ভেড়ার পরিচর্যা করতে হবে। বিভিন্ন বয়সের ভেড়াকে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা করতে হবে। তাছাড়া গর্ভবতী, প্রসূতি, নবজাতক প্রভৃতি ভেড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। নিম্নলিখিতভাবে ভেড়ার পরিচর্যা করা যায়। যথা:-

- প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বের করে মাঠে চড়ার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। তারা যেন পর্যাপ্ত সময় মাঠে চড়তে পাড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ঘর ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। গোবর বা চনা যেন কোন রোগের কারণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সপ্তাহে অন্তত একবার জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে ঘর জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- এদের চিহ্নিত করার জন্য অবশ্যই কানে ট্যাগ নম্বর লাগাতে হবে।
- সাধারণত বিশেষ অবস্থা ছাড়া ভেড়াকে তেমন কোন দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হয় না। তবে, গর্ভবতী, প্রসূতি, বাচ্চা ভেড়া ও প্রজননের পাঠার জন্য সম্পূরক (supplementary) খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নিয়মিত ব্রাশ দিয়ে দেহ পরিষ্কার করতে হবে। এতে উলের ভেতরের ময়লা বেরিয়ে আসবে ও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে। নিয়মিত ব্রাশ করলে উল উজ্জ্বল দেখাবে ও চামড়ার মান বৃদ্ধি পাবে।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ভেড়ীর দুধ দোহন করতে হবে। দুধ দোহনের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
- ভেড়ার উল কাটার পূর্বে এদেরকে বহিঃপরজীবীনাশক ওষুধ দিয়ে গোসল করাতে হবে বা ওষুধ গায়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনভাবেই ভেড়া যেন বিষাক্ত বহিঃপরজীবীনাশক ওষুধ খেয়ে না ফেলে। এভাবে বহিঃপরজীবীনাশক ব্যবহার করলে বিভিন্ন ধরনের উকুন, আঁটালি ও অন্যান্য বহিঃপরজীবী ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি উল থেকে বিভিন্ন ময়লা দূর হয়, মাছির কীড়া দেহে বাসা বাঁধতে পারে না। এতে উলের মানও বৃদ্ধি পায়।
- নির্দিষ্ট মৌসুমে ভেড়ার দেহ থেকে উল কেটে নিতে হবে। প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভেড়াকে একাজে ব্যবহারের পূর্বে উল কেটে দিলে প্রজনন ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ে।
- প্রজননের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্য না থাকলে পুরুষ বাচ্চা ভেড়াকে সময়মতো খাঁসি করে নিতে হবে।
- অসুস্থ ভেড়াকে অন্যান্য সুস্থ ভেড়া থেকে পৃথক করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকল বয়সের ভেড়াকে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে ও টিকা প্রদান করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা ক্লাশে চারটি দলে ভাগ হয়ে বাচ্চাসহ ১০টি বড় ভেড়ী, বাচ্চা ছাড়া ১০টি বড় ভেড়ী, বাচ্চাসহ ১০টি ছোট ভেড়ী ও বাচ্চা ছাড়া ১০টি ছোট ভেড়ীর জন্য মাঁচার মেঝে ও খড়ের মেঝেতে সর্বমোট প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ হিসেব করে বের করবে।

সারসংক্ষেপ

ভেড়া তুলনামূলকভাবে দামে সস্তা। দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে; ১৫ মাসে দুবার বাচ্চা দেয়। এদের পশম বা উল অত্যন্ত দামি। উল থেকে শীতবস্ত্র, কম্বল, শাল ইত্যাদি তৈরি হয়। ভেড়ার জন্য তেমন কোন বাসস্থান লাগে না। এরা শুধু ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তেমন কোন সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। কারণ এরা প্রধানত মাঠে চরে ঘাস খাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। ভেড়ার জন্য তিন ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয়, যথা:- উন্মুক্ত, আধা-উন্মুক্ত ও আবদ্ধ ঘর। এদের ঘরের জন্য ভূমিসমতল মেঝে বা মাঁচার মেঝে তৈরি করা যায়। মাঁচার মেঝেতে জীবাণু ও কৃমি সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা কম। নিয়মিত ব্রাশ দিয়ে দেহ পরিষ্কার করলে উলের ভিতরের ময়লা বেরিয়ে আসে ও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বাড়ে। উল কাটার পর্বে এদেরকে বহিঃপরজীবীনাশক ওষুধ দিয়ে গোসল করাতে হবে। সকল বয়সের ভেড়াকে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে ও টিকা প্রদান করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। ভেড়া ১৫ মাসে কতবার বাচ্চা দেয়?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

২। ২৩ কেজি ওজনের মর্দা ভেড়ার জন্য মাচার মেঝে কত বর্গমিটার হয়?
ক) ০.২৫-০.৫০ খ) ০.৩০-০.৬০ গ) ০.৪৫-০.৫৫ ঘ) ০.৫৫-০.৬৫

৩। ভেড়া পালনের জন্য বাংলাদেশে কত ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয়?
ক) তিন খ) চার গ) পাঁচ ঘ) ছয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

মজিদ সাহেব ভেড়ার খামার করার সিদ্ধান্ত নেন। তার এলাকায় বৃষ্টিপাত কম হয়।

৪। মজিদ সাহেবের ভেড়ার ঘর হবে-
ক) উন্মুক্ত খ) অর্ধ-উন্মুক্ত গ) আবদ্ধ ঘ) অর্ধ-আবদ্ধ

৫। মজিদ সাহেবের ভেড়ার ঘরের বৈশিষ্ট্য হলো-
i) ছাদ থাকবে না
ii) মেঝেতে খড় থাকবে
iii) কোন বেড়া থাকবে না

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৪ হাঁস পালন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হাঁস পালনের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন ।
- হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ উপস্থাপন করতে পারবেন ।
- উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের হাঁসের নাম উল্লেখ করতে পারবেন ।
- হাঁস পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন ।
- হাঁসের স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ও রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা লিখতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	হাঁস, হাঁসের জাত, পালন পদ্ধতি, উন্মুক্ত পদ্ধতি, অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি, আবদ্ধ পদ্ধতি, হার্ডিং পদ্ধতি, লেন্টিং পদ্ধতি ।

হাঁস পালনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক পর্যায়ে হাঁস পালন একটি অত্যন্ত প্রাচীণ রীতি । দেশে প্রচুর খাল, বিল, ডোবা, নালা, জলাশয়, হাওর, বাওর, পুকুর ও নদী রয়েছে যেখানে হাঁস স্বাধীনভাবে চড়ে বেড়াতে পারে ও নিজেদের খাদ্য নিজেরাই জোগাড় করতে পারে । তাই অল্প মূলধনে হাঁস পালন করে ডিম বিক্রি করে বেশি মুনাফা অর্জন করা যায় । মাছের পুকুরে হাঁস চাষ করলে খামারিরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আরও লাভবান হতে পারেন । কারণ হাঁসের মলমূত্র উৎকৃষ্টমানের জৈব সার । তাছাড়া হাঁসের ডিমে রয়েছে অধিক আমিষ ও ভিটামিন যা আমাদের দেহের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় । যদিও বর্তমানে এদেশে বাণিজ্যিকভিত্তিতে বেশকিছু হাঁসের খামার গড়ে ওঠেছে কিন্তু মুরগির তুলনায় তা নিতান্তই কম ।

হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ

- হাঁস পুকুর, খাল, বিল, ডোবা, নদী, নালা, জলাশয়, হাওর, বাওর ইত্যাদিতে চড়ে খেতে পারে বলে সম্পূরক খাদ্য খুব কম লাগে । ফলে হাঁস পালনে খাদ্য খরচ মুরগির তুলনায় অনেক কম ।
- মুরগি তুলনায় হাঁস পালন অনেক সহজ । মুরগি পালনে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, হাঁস পালনে ততটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় না ।
- মুরগির তুলনায় হাঁসের রোগব্যাধি অনেক কম এবং হাঁস সহজে রোগাক্রান্ত হয় না ।
- হাঁসের জন্য বাসস্থান বাবদ খরচ মুরগির তুলনায় অনেক কম লাগে ।
- হাঁসের ডিম সচরাচর মুরগির তুলনায় বড় হওয়ায় পুষ্টিও বেশি থাকে ।
- গ্রামীণ পরিবেশে মুরগির তুলনায় হাঁসের খামার ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ ।
- ঘাঁস-মাছের সমন্বিত চাষ করলে মাছের জন্য সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না । কারণ হাঁসের মলমূত্রই মাছের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে কাজ করে ।
- হাঁসের মলমূত্র উৎকৃষ্টমানের জৈব সার হওয়ায় সবজি বাগানের জন্য উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে ।

হাঁসের জাত

উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাঁসের জাতগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায় । যেমন:-

- ডিম উৎপাদনকারী জাত, যেমন:- ইন্ডিয়ান রানার, খাকি ক্যাম্পবেল, জিনডিং ইত্যাদি ।
- মাংস উৎপাদনকারী জাত, যেমন:- পিকিন, মাসকোভি, আইলসবেরি, কোয়াগা, রোয়েন ইত্যাদি ।
- শোভবর্ধনকারী জাত, যেমন:- কল, ক্রেস্টেড, ব্লু সুইডিশ, ব্ল্যাক ইস্ট ইন্ডিয়া ইত্যাদি ।

হাঁস পালন পদ্ধতি

সাধারণত হাঁস পালনে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যথা:-

১) উন্মুক্ত পদ্ধতি (Open system)
২) অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি (Semi-intensive system)
৩) আবদ্ধ পদ্ধতি (Intensive system)
৪) হার্ডি পদ্ধতি (Harding system)
৫) লেন্টিং পদ্ধতি (Lenting system)

উন্মুক্ত পদ্ধতি

এটি হাঁস পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। গ্রামাঞ্চলে এ পদ্ধতিতেই হাঁস পালন করা হয়। এ পদ্ধতিতে দিনে হাঁসগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয় ও রাতে নির্দিষ্ট ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। হাঁসকে কোন খাবার দেয়া হয় না বললেই চলে। কারণ, এরা সারাদিন প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য নিজেরাই সংগ্রহ করে খায়। তবে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেন, ডিমপাড়া বা লেয়ার হাঁসগুলোকে সকাল ৮.৩০-৯.০০ টা পর্যন্ত ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। যেসব অঞ্চলে পতিত জমি রয়েছে ও খাল-বিল বা হাওর-বাওর বেশি সেখানে এ পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো।

উন্মুক্ত পদ্ধতির সুবিধা

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:-

- এতে খাদ্য খরচ কম হয়।
- বাসস্থানের জন্য খরচ কম হয়।
- মুক্ত আলো-বাতাসে চলাফেরা করতে পারায় আবদ্ধ পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে হাঁসের দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

উন্মুক্ত পদ্ধতির অসুবিধা

উন্মুক্ত পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:-

- এতে বেশি পরিমাণ জমির প্রয়োজন হয়।
- খারাপ আবহাওয়ায় হাঁসের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- সবসময় পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে হাঁসগুলোকে রাতে ঘরের ভিতরে রাখা হয় ও দিনে ঘরসংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট গ-ির মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়। এ নির্দিষ্ট গন্ডিকে রেঞ্জ (range) বলে। এ গন্ডির ভিতরে প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রায় ০.৯৩ বর্গমিটার (প্রায় ১০ বর্গফুট) জায়গার প্রয়োজন হয়। এ পদ্ধতি বাড়ন্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসের জন্য উপযোগী। রেঞ্জ বা গন্ডির ভিতরে সিমেন্ট দিয়ে বড় ধরনের পানির পাত্র তৈরি করা থাকে। এখানে হাঁসগুলো যেমন সাঁতার কাটতে পারে, তেমনি পানিও পান করতে পারে।

আবদ্ধ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে (environmentally controlled house) হাঁসগুলোকে সবসময় আবদ্ধ রাখা হয়। বাচ্চা হাঁস পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। আবদ্ধ পদ্ধতি কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন:-

ক) মেঝে পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চগুলো আবদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে পালন করা হয়। এ ধরনের মেঝেতে লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খাবার ও পানি দিয়ে লিটার যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ঘরের এককোণে তারজালের উপর পানি ও খাবার পাত্র রাখা হয়।

খ) খাঁচা বা ব্যাটারি পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে খাঁচায় পালন করা হয়। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.০৭ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়। বাচ্চা পালনের জন্য এই পদ্ধতিটি বেশ সুবিধাজনক।

গ) তারজালির মেঝে পদ্ধতি: এক্ষেত্রে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে তারজালি দিয়ে নির্মিত মেঝেতে পালন করা হয়। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.০৪৭-০.০৭ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়।

আবদ্ধ ও অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতির সুবিধা

আবদ্ধ ও অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ। যেমন:-

- এতে জায়গা কম লাগে।
- শ্রমিক কম লাগে।
- খাদ্যগ্রহণ সমভাবে হয়।
- খারাপ আবহাওয়া ও বন্যপ্রাণীর উপদ্রব থেকে রক্ষা করা যায়।
- স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রদান করা যায়।

আবদ্ধ ও অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতির অসুবিধা

আবদ্ধ ও অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ। যেমন:-

- এতে বেশি পরিমাণ খাবার সরবরাহ করতে হয়।
- যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ খরচ বেশি হয়।
- মুক্ত আলো-বাতাসের অভাব দেখা দেয়।
- খরচ বেশি হয়।

হার্ডিং পদ্ধতি

এ পদ্ধতি বাড়ন্ত ও বয়স্ক হাঁস পালনের জন্য উপযোগী। এক্ষেত্রে হাঁসের জন্য নির্দিষ্ট কোন ঘর থাকে না। হাঁসগুলো দল বেঁধে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। একটি দলে সচরাচর ১০০-৫০০টি হাঁস থাকে। সন্ধ্যায় এদেরকে একটি খাঁচি বা অন্য কোনভাবে কোন উঁচু স্থানে আবদ্ধ করে রাখা হয় ও সকালে ডিম সংগ্রহ করে আবার ছেড়ে দেয়া হয়। হাঁসগুলোর তত্ত্বাবধানে একজন মানুষ নিয়োজিত থাকে। যেসব এলাকায় প্রাকৃতিক উৎস থেকে বেশি খাদ্য পাওয়া যায়, যেমন:- ফসল কাটা জমি, সেখানে হাঁসগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ এলাকায় কিছুদিন পালন করার পর খাদ্যাভাব দেখা দিলে আবার নতুন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে খাদ্য খরচ নেই বললেই চলে। তবে, বিভিন্ন রোগ ও চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এ পদ্ধতিতে পালিত হাঁসের ১০-১৬% মারা যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও ভারতের কোন কোন স্থানে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন করা হয়ে থাকে।

লেন্টিং পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে হাঁসের জন্য ভাসমান ঘর তৈরি করা হয়। হাঁসগুলো সারাদিন ঘুরে বেড়ায় ও রাতে ঘরে আশ্রয় নেয়। সাধারণত নিচু এলাকা যেখানে বন্যা বেশি হয় সেখানে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন বেশ সুবিধাজনক।

হাঁসের স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ও রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা

যদিও মুরগির তুলনায় হাঁসের রোগব্যাধি অনেক কম তথাপি হাঁসের খামারে, বিশেষ করে ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। হাঁস পালনে নিম্নোক্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে হাঁস খামার থেকে অধিক ডিম, মাংস ও সর্বোপরি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। এগুলো নিম্নরূপ:-

- ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা।
- ঘরের ভিতরের খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- পচা-বাসি ও ছত্রাকযুক্ত খাবার সরবরাহ না করা।
- দ্রুত মলমূত্র নিষ্কাশন করা।
- খামারে মৃত হাঁস ও বর্জ্য দ্রুত অপসারণ করা।
- নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা।
- নিয়মিত জীবাণুঘটিত রোগের টিকা প্রদান করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় হাঁস পালনের জন্য কোন্ পদ্ধতিটি বেশি উপযোগী তা যুক্তিসহকারে ক্লাশে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক পর্যায়ে হাঁস পালন করা হয়। মুরগির তুলনায় হাঁস পালন সহজ ও এতে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাঁসের জাতগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন:- ডিম, মাংস ও শোভাবর্ধনের জাত। পাঁচটি ভিন্ন পদ্ধতিতে হাঁস পালন করা হয়। যথা:- উন্মুক্ত, অর্ধ-আবদ্ধ, আবদ্ধ, হার্ডিং ও লেন্টিং পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এদেশে উন্মুক্ত ও অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিই বেশি জনপ্রিয়। যদিও মুরগির তুলনায় হাঁসের রোগব্যাধি কম তথাপি হাঁসের ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি-ব্যবস্থা সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে। এছাড়াও হাঁসকে নিয়মিত কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। আবদ্ধ ও অর্ধআবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পলনের সুবিধা হলো-

i) জায়গা কম লাগবে
ii) শ্রমিক কম লাগে
iii) খরচ কম হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ডিম পাড়া হাঁসকে কয়টা পর্যন্ত আটকে রাখতে হয়?

ক) ৬:৩০-৭:০০ খ) ৭:৩০-৮:৩০
গ) ৮:৩০-৯:০০ ঘ) ৩:৩০-১০:০০

৩। বাচ্চা হাঁস পালনের জন্য উপযোগী পদ্ধতি কোনটি?

ক) উন্মুক্ত খ) আবদ্ধ
গ) অর্ধ-আবদ্ধ ঘ) হার্ডি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ নং ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

হাবিবা তার পুকুড় পাড়ে হাঁসের জন্য একটি ঘর তৈরি করেছেন। তিনি ঘরের চারপাশ চাটাই দিয়ে বেড়া দিয়েছেন। পুকুরের কিছু অংশ বেড়ার মধ্যে নিয়েছেন। হাঁসগুলো ঐ নির্দিষ্ট জায়গাতেই বিচরন করে।

৪। হাবিবার হাঁস পালনের পদ্ধতিটির নাম-

ক) উন্মুক্ত খ) আবদ্ধ
গ) অর্ধ-আবদ্ধ ঘ) লেন্টিং

৫। এ পদ্ধতিটির সুবিধা হলো-

i) বাড়ন্ত ও প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের জন্য উপযোগী
ii) ঘরের ভিতর বড় পানির পাত্র থাকে
iii) হাওর-বাওর এলাকার জন্য প্রযোজ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মনিরা বেগমের বসত বাড়ির পাশেই ৫ শতকের একটি জলাশয় আছে। তাই সেখানে তিনি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ১৫০টি হাঁস পালন শুরু করেন। কিন্তু হাঁসগুলো মাঝে মধ্যেই অন্য জমির ধান ফসলের ক্ষতি করে। তারই ছেলে ৯ম শ্রেনির ছাত্র কবীর আহমেদ মাকে অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের পরামর্শ দেয় এবং এতে তিনি অনেক লাভবান হন।

ক. ডিম উৎপাদন হাঁসের ২টি জাতের নাম লিখুন।

খ. উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ডিম পাড়া হাঁসকে সকাল ৯টা পর্যন্ত আবদ্ধ রাখতে হয় কেন?

গ. মনিরা বেগম তার জলাশয়ে আর কতটি হাঁস অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন করতে পারতেন-ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. কবীর আহমেদের দেয়া পরামর্শের সাথে আপনি কি একমত? যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষন করে মূল্যায়ন করুন।

২। হাসান সাহেব একটি উন্নত জাতের জার্সি গাভী ক্রয় করেন। তিনি গাভীটিকে নিয়মিত প্রয়োজনীয় খাদ্য খাওয়ান এবং দেখাশোনা করেন। কিন্তু গাভীটি কিছু দিনের মধ্যে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। ফলে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং একজন পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নেন।

ক. শাল দুধ কী?

খ. কী কী কারনে ভেড়ার বাসস্থানের প্রয়োজন?

গ. হাসান সাহেব কীভাবে তার গাভীটির পরিচর্যা করবেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. হাসান সাহেবের গাভীটির অসুস্থ্য হওয়ার কারণ বিশ্লেষন করুন।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ১০.১ : ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ
উত্তরমালা- ১০.২ : ১। ঘ ২। খ ৩। ঘ ৪। ক ৫। ঘ
উত্তরমালা- ১০.৩ : ১। ঘ ২। খ ৩। ক
উত্তরমালা- ১০.৪: ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। গ ৫। ঘ